বর্ণমালা কার্ডের সাহায্যে বর্ণপরিচয়

অনিরুদ্ধ

বিনাপয়সায় একটি এনজিও সংস্থা বর্ণমালা কার্ড দিলেই নিরক্ষর ব্যক্তিরা আগ্রহী হয়ে উঠবেন উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত স্বয়ংক্রিয়ভাবে, এটা খুব বাস্তব বলে মনে হয় না। কোথাও কেউ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন, সেটা ব্যতিক্রম কিন্তু নিয়ম নয়। এই প্রকল্পের প্রবক্তারা নিশ্চিত হলেন কিভাবে যে কোন প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সদ্য সাক্ষরতাপ্রাপ্তদের পরীক্ষা গ্রহণ করবে কিংবা এই কার্ডধারীরা সকলেই উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত বর্ণপরিচয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। এমনটা ভাবা খুব যুক্তিপূর্ণ নয়। প্রয়োজনের সঙ্গে মিলাতে না পারার জন্য অনেক গরিব বাপ-মা তার শিশু সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে খুব আগ্রহ দেখান না। বরঞ্চ সংসারের কাজে বাপ-মা যে শিশু সন্তানটির সাহায্য পান, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা শূন্য বলেই তারা অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন অথবা উভয়েরই সহযোগিতা ও অঙ্গীকার ছাড়া এ ধরনের প্রকল্প কীভাবে ঈপ্সিত সুফল দেবে তা যেমন ভেবে দেখা দরকার, তেমনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই অভিনব প্রকল্প কোন একটি এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তে তার ফলাফল দেখে নেয়া প্রয়োজন। ছ' মাসের মধ্যে দু কোটি লোককে সাক্ষর করার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কোন একটি এলাকায় এরূপ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সাফল্যের পূর্বে কোনরূপ মন্তব্য সমীচীন হবে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে ঃ বৃক্ষ তোমার নাম কি? গাছটির জবাব হলো ফল দিয়েই আমার পরিচয় মিলবে। অর্থাৎ একটি বৃক্ষের পরিচয় মেলে, গাছটিতে কী ফল ধরেছে। সংস্কৃতে বলা হয়েছে ঃ ফলেন পরিচীয়তে।

আট-এর দশকের প্রথম দিকে জাতিসংঘের তরফ থেকে তার বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কিছু শ্লোগান চালু করা হয়। তার মধ্যে একটি হলো ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা। অনুরূপভাবে আরও একটি শ্লোগান ছিল ২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য। শেষোক্তটির ক্ষেত্রে শিশুদের ৬টি রোগ নির্মূলের জন্য পোলিও টীকা সেবন/প্রদানসহ আরও কিছু কর্মসূচি নেয়া হয়। তার অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা কমবেশি ওয়াকিফহাল। প্রথম শ্লোগানটি ছিল ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা। এই শিক্ষা সংক্রান্ত শ্লোগানটি ২০০০ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগান হিসেবে এখন সামনের দিকে চলে আসছে।

স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা এক্ষেত্রে এজন্য উল্লেখ করা হলো, রোগব্যাধি সম্পর্কে আমাদের যেমন কিছু কুসংস্কার আছে, তেমনি রোগব্যাধি না হয় কিংবা তা প্রতিরোধের জন্য কী কী করণীয় এ সম্পর্কে সাধারণ লোকের মধ্যে সচেতনতার অভাব ছিল। বিশুদ্ধ পানি, রোগ প্রতিরোধে টীকা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে সরকার ও এনজিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে, সচেতনতা সৃষ্টি করছে। নলকূপ স্থাপন ইত্যাদির ভার সরকার ও পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রহণের ব্যবস্থা দ্রুততর হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

অপরদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইউনেস্কো উদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সম্পর্কে যে সনদ প্রণয়ন করেছে তাতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লোককে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই বয়স ১৬ বছর পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। ১৬ বছর বয়সের একজন নাগরিককে শিশু হিসেবে গণ্য করে তার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরকার এই শিশু অধিকার সনদে অন্যতম স্বাক্ষরদাতা। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকার ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগ রয়েছে। এই বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছে এনজিও। আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার বর্তমানে সরকারের দাবিমতো শতকরা ৬০ ভাগের উপর। কয়েক বছর পূর্বেও এই সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৪০ শতাংশের উপর। সরকার আশা করে এবং দাবি করে, আগামী ২০০৬ সাল নাগাদ দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হবে। সরকার এ সংকল্প ব্যক্ত করেছে, ২০০৬ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

একটু পেছনে ফিরে দেখা যাক। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা দাবির মধ্যে ছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন। দাবিটা নতুন নয়। বৃটিশ আমলে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও ১৯৩৬ সালে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি করা হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার পর্যায়ক্রমে ৪৪ হাজারের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ করে। সরকারি পর্যায়ে এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক করেছে এবং ৯-এর দশকে এসে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। দারিদ্র্য এবং বিভিন্ন কারণে দেখা গেল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রথম দু বছরে ড্রপআউট অর্থাৎ শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে এমন শিশুর সংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণীতে এসে ড্রপআউটের হার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১৭ হাজার হবে। তারপর দীর্ঘকাল যাবৎ সাক্ষরতার হার শতকরা ৩৫/৪০ ছিল। সরকার ও এনজিওগুলোর ব্যাপক উদ্যোগের পর বর্তমানে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৭ ভাগের মতো।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তাহলো একবার বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর যদি লেখাপড়ার চর্চা না থাকে, তবে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে এমন নাগরিকদের একটা অংশ পুনরায় নিরক্ষরের পর্যায়ে নেমে যায়। তাই সরকার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বয়স্কদের পত্র-পত্রিকা পড়া, গল্প উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি বইপড়া এবং পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠাগারের ব্যবস্থা এই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে।

ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি এনজিও নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বেশকিছু এনজিও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে অংশ নিয়েছে। কোন নতুন পদ্ধতি কিংবা কীভাবে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা যায়, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে না তারা।

সাধারণত দেশবাসী সকলকে শিক্ষিত করার জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়। এজন্য একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ খাতে অর্থ বরাদ্দ ও অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালনের জন্য তাই শিক্ষানীতি নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের নির্দেশনার পথেই বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা উদ্যোগ নিয়ে তাদের সীমিত সাধ্য নিয়ে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। এটি আজকের দিনের বাস্তবতা।

যেখানে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নেই, সেখানেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ কিংবা শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। রাশিয়ায় প্রাক-বিপ্লব যুগে জার শাসিত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম প্রধান দেশগুলো, যথা উজবেকিস্তান, কাজাখস্তানে শিক্ষার হার ছিল সর্বনিম্ন। ইউরোপীয় রাশিয়ায় শিক্ষার হার অনেক বেশি থাকলেও তা ছিল ৫০ শতাংশের বহু নিচে। তখনকার রুশ শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ, এমনকি বিদেশীরাও বলতেন, উজবেকিস্তানের শিক্ষার হার শতকরা ৯০ ভাগ কিংবা সেখানে নিরক্ষরতা দূর করতে ২৫০ বছর লাগবে। তারপর অক্টোবর বিপ্লব হলো। সোভিয়েত সরকার সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেয়। ১৯২০-২২ সাল পর্যন্ত চলে গৃহযুদ্ধের জের। প্রাক-জার শাসিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যা পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় অঙ্গরাজ্য হিসেবে নয়– পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে। তখন দেখা গেল একেবারে অনুন্নত এসব দেশে মাত্র দশ/পনের বছরের মধ্যে শিক্ষিতের হার কোথাও কোথাও ৯০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। কোথায় ২৫০ বছর লাগার কথা বিশেষজ্ঞদের মতে, সেখানে মাত্র ১৫ বছরে প্রায় সবাই শিক্ষার আলো পেয়েছে। সোভিয়েত মধ্যপ্রাচ্যে তৎকালে কোন কোন দেশের নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না। তাদের মাতৃভাষায় বইপুস্তক ছিল না। সেখানে রোমান হরফ চালু করে তাদের মধ্যে শিক্ষাদানের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জার শাসিত আমলে স্থানীয় অভিজাতরা রুশ ভাষায় শিক্ষালাভ করত। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারটা ছিল অভাবনীয়। একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে চালু ছিল আরবি ভাষায়। তার সুযোগও গ্রহণ করতে পারত মুষ্টিমেয় লোকজন।

আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে আধুনিক স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। নিচের দিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার জন্য পাঠশালা ছিল। তা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে। সেখানে বাংলার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো। অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক চতুর্থ শ্রেণী হতে। কোথাও কোথাও তৃতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজি শিক্ষা চালু ছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে। শিশু বয়স থেকেই তখন দুটো ভাষা শিখতে হতো। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে সংস্কৃত ও আরবি ভাষাও শিখানো হতো। এ হলো ইংরেজি স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা। বৃটিশ শাসনের অবসানের পরই সকলকে শিক্ষিত করার দৃষ্টিভঙ্গি সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হলেও তার বাস্তব উপকরণ ছিল অপ্রতুল। শিক্ষা বিস্তারের সামাজিক আন্দোলন বা সচেতনতা সৃষ্টির কাজটি আরও পরে শুরু হয়। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনে শিক্ষিতের হার শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেয়া হয়। তারপর এক পর্যায়ে আসে জাতিসংঘের সেই শ্লোগান– ২০০০ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

কীভাবে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা যায়, নিদেনপক্ষে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে জাতিকে মুক্ত করা যায় সেই প্রশ্নটি সামনে আসে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২৮ বছরে সাক্ষরতার হার দাঁড়িয়েছে ৬০% থেকে ৬৫%-এর মতো।

যত দ্রুত সম্ভব নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মধ্যে একটি নতুন ধারা সম্প্রতি যোগ হয়েছে। ২/৩ সপ্তাহ আগে গ্যারি ক্যান্টার নামে এক মার্কিন নাগরিক সংবাদ অফিসে আসেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তিনি একটি নতুন প্রণালি বা পদ্ধতি যাই বলি তা নিয়ে আলোচনা করেন। গ্যারি ক্যান্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনোয়াস অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী। তিনি সৃজনশীল বুদ্ধিভিত্তিক বিজ্ঞানের শিক্ষক। এক কথায় শিক্ষা বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ। প্রায় তিন বছর ধরে বাংলাদেশে আছেন। দিনাজপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন তার এই নতুন ধারায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি প্রচলন করার লক্ষ্যে। তিনি দাবি করেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। কীভাবে স্বল্প ব্যয়ে কিংবা নামমাত্র ব্যয়ে ব্যাপক হারে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব তার জন্য একটি প্রকল্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো কাঠামোর বাইরে যাকে আমরা উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গন বলতে পারি – সেই পরিবেশে তিনি কার্ড বর্ণমালার মাধ্যমে নিরক্ষরদের বর্ণপরিচয় করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। কার্ডের একদিকে থাকবে ইংরেজি বর্ণমালা এবং অপরদিকে থাকবে বাংলা বর্ণমালা। আলোর দিশারী নামে একটি এনজিওর মাধ্যমে তিনি তার প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বলেন। আলোর দিশারী সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন গ্যারি ক্যান্টারকে। বর্ণমালা কার্ডে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকার মহোদয়ের ছবি থাকবে। রংধনু বা সপ্তবর্ণা কার্ডটি বিতরণ করা হবে নিরক্ষরদের মধ্যে। স্থানীয়ভাবে পরিচিত লোকদের সহায়তা নিয়ে বর্ণপরিচয় তথা প্রাথমিকভাবে কিছুটা শিক্ষা লাভের পর তাকে/ তাদেরকে প্রদত্ত নির্দেশমতো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমের কাছে তারা যাবেন এবং সেখানে তাদের অধীত বিদ্যা সংক্রান্ত অর্থাৎ সাক্ষরতার উপর পরীক্ষা নেয়া হবে।

খুবই চিত্তাকর্ষক প্রকল্প। কিন্তু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণমাধ্যমগুলোর লোকজন [illegible]